

বক্তব্য লেখন

কোনো সভা-সমাবেশ, আলোচনা সভা, সেমিনার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে কোনো বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতি, সানন্দীল ভাষায় প্রতিমধুর স্বরে বক্তব্য প্রদান করাকে বক্তব্য বা ভাষণ বলে। মূলত ইংরেজি Talk, Speech, Lecture, Address ইত্যাদি শব্দকে বাংলায় ভাষণ, বক্তৃতা, বক্তৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ভাষণ হচ্ছে এক ধরনের বাচনিক শিল্প বা বাকশিল্প। চমৎকার করে বক্তৃতা বা ভাষণ প্রদান করা এক ধরনের দক্ষতা। এ দক্ষতা সবার থাকে না। ফলে, ভাষণ বা বক্তৃতা অনেক সময় যেমন আকর্ষণ সৃষ্টি করে, তেমনি আবার কারো কারো বক্তৃতা বিরক্তিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের মনের শ্রেষ্ঠবাহন ভাষা। এ ভাষার শৈল্পিক বা উৎকৃষ্ট প্রকাশকৌশলই ভাষণকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করতে গেলে মানুষকে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে ভাষণ বা বক্তৃতা প্রদান করতে হয়। এ বক্তৃতা নিয়মসিদ্ধভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

বক্তব্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ভাষণের উদ্দেশ্য বা মূল লক্ষ্য শ্রোতা বা দর্শককে কোনো বিষয়ে তথ্য প্রদান করা। কোনো ঘটনা বা আদর্শের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে সমর্থন অর্জনের জন্য বক্তা ভাষণ প্রদান করেন। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে, সাহিত্য-সংস্কৃতি ধর্ম, অর্থনীতি ইত্যাদি নানা উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করার রীতি প্রচলিত আছে।

বক্তব্যের ভাষা হতে হয় সরস ও তথ্যসমৃদ্ধ। তা না হলে শ্রোতাদের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে। সেজন্য ভাষণ প্রদানের সময় অনেক বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রাখতে হয়। বক্তা তার উদ্দেশ্য সাধানের জন্য অনেক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। কথার সৌন্দর্য দিয়ে শ্রোতার মনেও হৃদয়াবেগের সঞ্চার করেন। তবে সেটারও স্থান কাল বা ক্ষেত্র নির্বিশেষে পার্থক্য আছে। যেমন দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী যখন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন তখন সেখানে রসালো ভাষা থাকে না। তবে সেই ভাষণে থাকে অনেক তথ্য, তত্ত্ব ও প্রজ্ঞা। বক্তার অন্যতম লক্ষ্য হলো শ্রোতাকে অনুপ্রাণিত করা। বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ জনগণকে বক্তৃতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। আমরা জগৎবিখ্যাত কোনো কোনো বাঘানেতার নাম জানি যারা বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে তাঁর পক্ষে এনেছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতার ঋণনায়ক ও প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম, লিংকন, ইংল্যান্ডের উইনস্টোন চার্চিল, এডমন্ড বার্ক, জার্মান নেতা এডলফ হিটলার, বাংলাদেশের মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ নেতার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের অমোঘ ঘোষণা। তাঁর ভাষণে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

নানা প্রয়োজনে ভাষণ বা বক্তৃতার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষকে নানা ফোরামে দেখা বলতে হয়। শিক্ষক, কর্মকর্তা, আইনজীবী, আমলা, নেতা সবাইকে শ্রেণিকক্ষ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সভাসমিতি, ক্লাব, পার্টি বা কর্মস্থলের নানা কর্ম উপলক্ষে বক্তৃতা করতে হয়।

বক্তব্যের গুরুত্ব

তথ্য বলা বা সুন্দর করে নিজের চিন্তা-ভাবনা ব্যক্ত করা বা বাগ্মিতা সকল যুগেই গুণধর্ম হিসেবে বিবেচিত। প্রাচীন কালে বক্তার বাগ্মিতা পাণ্ডিত্য ও বৈদম্ব্যের প্রকাশ বলে বিবেচিত হতো। আধুনিক কালেও তা প্রসংশিত। দার্শনিক-বিজ্ঞানী-রাজনীতিবিদ-সমাজতাত্ত্বিক-ধর্মগুরু-এঁরা সবাই বাগ্মী ছিলেন। দার্শনিকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞানীর উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, রাজনীতিবিদের রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজতাত্ত্বিকের তাত্ত্বিক রূপাবয়ব, ধর্মগুরুর ধর্মের স্বরূপ তাঁরা তাদের বক্তৃতা বা ভাষণের মাধ্যমেই প্রচার করেছেন। তাই ভাষণের গুরুত্ব বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

বক্তব্যের উপাদান

ভাষণের মূল উপাদান চারটি। যথা : ১. বক্তা ২. শ্রোতা ৩. বক্তব্যের বিষয় ৪. বক্তব্যের স্থান।

বক্তা-শ্রোতা-বক্তব্য এগুলো পরিপূরক অনুযায়। বক্তার কাজ বক্তব্য প্রদান করা এবং শ্রোতার কাজ শ্রবণ করা। তবে বক্তার ও শ্রোতার উভয়ের মধ্যেই একটি লক্ষ্য কাজ করে। বক্তা যে উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন শ্রোতা অনুরূপ উদ্দেশ্যে তা শ্রবণ করেন। অর্থাৎ যেখানে একটি বিষয় থাকে সে বিষয়টি বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে এক ধরনের মানসিক যোগাযোগ তৈরি করে। অপরদিকে, ভাষণ প্রদানের ও শ্রবণের জন্য বক্তা শ্রোতার একটি সমাবেশ করানোর স্থান নির্ধারণ করা হয়। সেই স্থানে সকলে নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত হয়ে থাকে। তাই ভাষণের সঙ্গে এই চারটি উপাদানের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে।

বক্তব্যের শ্রেণিবিভাগ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ভাষণ নানা পর্যায়ে নানা কারণে দেওয়া হয়ে থাকে। সেইসূত্রে ভাষণকে কোনো নির্দিষ্টভাবে শ্রেণিকরণ সম্ভব বা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। বিষয়গত কারণে ভাষণ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। আবার বক্তার অবস্থানও হতে পারে বিভিন্ন স্থানে। যেমন-মাঠে-ময়দানে, হাটে-বাজারে, স্কুলে-কলেজে, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বেতার, টেলিভিশন, পার্লামেন্ট এমনকি পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত রূপও ভাষণ হতে পারে। তবে ভাষণকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন:

লিখিত বক্তব্য

অলিখিত বা তাত্ক্ষণিক বক্তব্য

লিখিত ভাষণের জন্য বক্তার পূর্ব প্রস্তুতি থাকে। মূলত লিখিত আকারে বাণীকে শ্রোতার সামনে পাঠ করে শোনানো হয়ে থাকে। বক্তা জনসমক্ষে বা বেতার টেলিভিশনে সেই লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান। অপরদিকে, পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই বক্তা তাত্ক্ষণিক ভাবে যে ভাষণ প্রদান করেন তা অলিখিত বা তাত্ক্ষণিক ভাষণ। তবে লিখিত ভাষণের একটি সুবিধা হলো এই যে, কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বা কল্পনিষ্ঠভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করা যায়। অন্যদিকে, তাত্ক্ষণিক ভাষণের ক্ষেত্রে এই সব বিষয়গুলো যথাযথভাবে রক্ষিত নাও হতে পারে। কিন্তু অনেক বক্তার বাগ্মিতার কারণে লিখিত বক্তব্যের চেয়ে তাত্ক্ষণিক ভাষণ আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

ক্ষতিগ্রস্ততা: প্রথমে বাহ্যিক ঘটলে বিরক্তিও উৎপাদন করে থাকে।

লিখিত ও অলিখিত বক্তব্যকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়:

- ক. নীতি-নির্ধারণী : অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কোনো ইস্যুতে জনমত গঠনে নানা ফোরামে নীতি-নির্ধারণী ভাষণ উপস্থাপন করা হয়। যেমন: 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হওয়া সম্ভব না অসম্ভব'-এ ধরনের বিষয়, যেখানে আলোচকেরা প্রস্তাবনার পক্ষে অথবা বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনে সচেষ্ট হন।
- খ. পেশাগত : বিভিন্ন পেশাজীবী, বিশেষ করে আইনজীবী, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ইত্যাদি তাদের পেশাগত কাজের অংশ হিসেবে প্রতিদিন যে ভাষণ দেয়, তাই পেশাগত ভাষণ। যেমন: একজন সাহিত্যের অধ্যাপক 'সৈয়দ শামসুল হকের গল্প বলার কৌশল' বিষয়ে একটি শ্রেণিকক্ষে ভাষণ দেন।
- গ. আনুষ্ঠানিক : কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকীতে অথবা কোনো বিশেষ দিন উদ্‌যাপন উপলক্ষে অথবা সমকালীন সমস্যামূলক কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা ডেকে যেসব বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়, তাকে আনুষ্ঠানিক ভাষণ বলে। 'প্রকাশনা শিল্পের ভবিষ্যৎ' একটি আনুষ্ঠানিক ভাষণ।
- ঘ. বিনোদনমূলক : বিবাহ অনুষ্ঠানাদি, বনভোজন বা অনুরূপ কোনো আনন্দময় পরিবেশে বিনোদনধর্মী যেসব সরস কথামালার আয়োজন করা হয় তাকে বিনোদনমূলক ভাষণ বলে। যেমন: 'স্ত্রীর মন জয়', 'বিয়ে না লড়াই'-এ রকম বিনোদনমূলক ভাষণের কিছু দৃষ্টান্ত।

বক্তব্যের কাঠামো

কথার বাহুল্য, সময়ের বাহুল্য, তথ্যের দৈন্য ইত্যাদি কারণে একটি ভাষণ অসফল হতে পারে। তাই একটি সার্থক ভাষণের জন্য চারটি অপরিহার্য অংশ থাকা প্রয়োজন। যথা :

- ক. সম্বোধন বা সম্বাষণ করা
- খ. বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে ভূমিকা বা সূচনা করা
- গ. মূল বক্তব্য
- ঘ. উপসংহার বা সারসংক্ষেপ করা এবং ধন্যবাদ প্রদান করা।

নিম্নে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো:

- ক. সম্বোধন : বক্তা মঞ্চে ও তার সামনে বসে জনগণকে সম্বোধন করে ভাষণ শুরু করেন। আনুষ্ঠানিক সভা-সমিতিতে এ সম্বোধন বেশ জরুরি। সভাপতি প্রধান অতিথিকে বিশেষ অতিথি এবং শ্রোতাকে সম্বোধন করে সাধারণত বক্তৃতা শুরু করা হয়।
- খ. বিষয়-উপস্থাপন : শ্রোতাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য বক্তা তাঁর বলবার বিষয়কে শ্রোতার সামনে প্রথমেই তুলে ধরেন।
- গ. মূল বক্তব্য : ভাষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান অংশ হলো মূল বক্তব্য। এ অংশে বক্তা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাঁর বক্তব্য বা আলোচনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ভাষণ মূলত

বিষয়ভিত্তিক হয় বলে বক্তাকে যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হয় সুনির্দিষ্ট ভাবে ক্রমপরম্পরায় বক্তব্যকে সুবিন্যস্ত ও সুসংহত করা। বক্তব্যের

ধারাবাহিকতা যেন রক্ষিত হয়, পারস্পর্য যেন জিন্ন না হয় এবং মূল প্রসঙ্গের যেন বিচ্যুতি না ঘটে সেদিকে বক্তাকে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হয়। মূল বক্তব্য যেন সহজেই শ্রোতাদের বোধগম্য হয় এবং মনে দাগ কাটে সেজন্যে তিনি প্রয়োজনমতো বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন। তাঁর অভিমতের সপক্ষে তথ্য, প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেন, প্রতিপক্ষের অগ্রহণযোগ্য যুক্তি খণ্ডন করেন। বক্তব্যের সমর্থনে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ, উদ্ধৃতি ইত্যাদি ব্যবহারও অনেক সময় অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। বক্তৃতাকে চমকপদ, আকর্ষণীয় ও হৃদয়গামী করার জন্য বক্তা মূল বক্তব্য আদ্যন্ত একভাবে উপস্থাপন করেন না। কোথাও তিনি ভাবগম্ভীর্যকে গুরুত্ব দেন, কোথাও শাণিত বাচনে বিরুদ্ধ ধারণাকে ছিন্নভিন্ন করেন, কোথাও তির্যক বাগ্মী সমস্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন, কোথাও নটকীয় জিজ্ঞাসায় শ্রোতাদের চিন্তাকে উসকে দেন। ফলে বক্তব্যের বিষয় শ্রোতার কাছে ক্রান্তিকর, একঘেয়ে বা গতানুগতিক মনে হয় না। বরং মস্তমুগ্ধের মতো শ্রোতারা নির্বিষ্ট মনে ভাষণ শোনেন। মূল বক্তব্য উপস্থাপনের কুশলতায় বক্তার বিষয়-জ্ঞান যুক্তিবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, বাগ্মিতা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে এবং বক্তৃতা হয়ে ওঠে শিল্পগণমণ্ডিত।

৬. উপসংহার: বক্তব্যের সমাপ্তি টানা হয় উপসংহারে। সার্থক উপসংহারের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে:
৮. এমনভাবে বক্তব্য পরিবেশন যেন শ্রোতারা বুঝতে পারেন যে বক্তা উপসংহার টানতে যাচ্ছেন:
৯. বক্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় বা সারবস্তুকে সহজবোধ্য অথচ শিল্পকুশলতায় উপস্থাপন;
১০. মূল বক্তব্য অনুবাদের জন্য কিংবা প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয়ে শ্রোতাদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ, আবেদন বা আহ্বান।

উপসংহার এমন হবে যেন তা চিন্তার দিক থেকে শ্রোতার মনে গভীর প্রভাব ফেলে এবং যথাসম্ভব তার হৃদয় জয় করা সম্ভব হয়। তাই মনে দাগ কাটে কিংবা শ্রোতাদের মন আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে এমন উক্তি দিয়ে বক্তৃতা শেষ করলে ভালো হয়। তাহলে ভাষণ শেষ হলেও তার রেশ থেকে যায়। সবশেষে আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি টানা হয় আয়োজক ও শ্রোতাদের কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ জানিয়ে।

বক্তব্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য

১. যৌক্তিক বক্তব্য : ভাষণের বক্তব্য হতে হবে যুক্তিনিষ্ঠ। তা না হলে দর্শক-শ্রোতা বক্তার কথায় আকৃষ্ট হবে না।
২. সর্বাধুনিক তথ্য দান : বক্তা তাঁর ভাষণে সর্বাধুনিক তথ্য প্রদান করতে পারেন; সর্বশেষ পরিস্থিতির চিত্র উপস্থাপন করতে পারলে সে ভাষণ অর্থবহ হবে।

৩. **পরিসংখ্যান প্রদান :** বক্তা ভাষণে পরিসংখ্যান প্রদান করেন, যা বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে। তবে পরিসংখ্যানটি হতে হবে সত্যনিষ্ঠ, বাস্তবতা ঘনিষ্ঠ ও বহুনিষ্ঠ।
৪. **ধারাবাহিকতা বজায় :** বক্তাকে তার বক্তবোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। ভাষণের মূল কাঠামো বজায় রাখা হয়েছে কিনা সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
৫. **ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ :** বক্তা নিজস্ব জীবনানুভূতি থেকে কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলে তা যদি যথোপযুক্ত হয়, তাহলে ভাষণটি দর্শক-শ্রোতা মাঝেই গ্রহণ করবে। তবে এক্ষেত্রে বক্তার পরিমিতবোধ থাকা একান্ত জরুরি।
৬. **বিনীত ও পরিশীলিত ভাষা :** ভাষণ দিতে গিয়ে অনেকেই জ্ঞানদান বা উপদেশ দেওয়া শুরু করেন। অনেকেই এমনভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন, যেন তার মতই চূড়ান্ত এবং তার মতের সঙ্গে সবাইকে একমত হতে হবে। ভাষণ সার্থক করতে হলে বক্তাকে নিরেট-কঠিন-একত্বের বক্তব্য পরিহার করতে হবে। কারো বক্তবোর সঙ্গে উপস্থিত সবাই একমত না-ও হতে পারে। তাই নিজস্ব মতামত প্রকাশের সময় প্রয়োজন মতো 'আমার মনে হয়', 'আমি মনে করি', 'আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা জানি না' ইত্যাদি বাক্যাংশ সংযুক্ত করা যেতে পারে।
৭. **কথকতামূলক ভাষা :** বক্তার ভাষা লিখিত ভাষার মতো শোনাতে তা দর্শক-শ্রোতার মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয় না। ভাষণকে তাৎপর্যমণ্ডিত ও অর্থবহ করে তুলতে হলে এর ভাষা হতে হবে কথকতামূলক। বক্তা যেন তার সহজ ও সাবলীল ভাষার আন্তরিকভাবে দর্শক-শ্রোতার সঙ্গে ভাব বিনিময় করেছেন-বক্তার ভাষা হবে এমন।
৮. **আবেগ সঞ্চার :** বক্তার যুক্তিরাশি দর্শক-শ্রোতার মনে যেন দাগ কাটে, এমনভাবে আবেগী ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। তবে আবেগের পরিমিত সম্পর্কে বক্তার বোধ থাকতে হবে। আবেগের মাত্রা যেন অতিক্রম না করে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
৯. **পুনরাবৃত্তি বর্জন :** অনেকের একই কথা বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলার প্রবণতা রয়েছে। এতে অযথা যেমন কালক্ষেপণ হয় তেমনি বিরক্ত হয় দর্শক-শ্রোতা। তাই বক্তাকে লক্ষ রাখতে হবে, তিনি যেন একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে দর্শক-শ্রোতার বিরক্তির কারণ হয়ে না দাঁড়ান।
১০. **বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করা :** বক্তব্য কতটা দীর্ঘ হবে, বক্তৃতার শুরুতেই বক্তার উচিত আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলে তা জেনে নেওয়া। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বক্তৃতা শেষ করার ব্যাপারে বক্তাকে সচেতন থাকতে হবে। অনেক বক্তা বক্তব্য শুরু করে আর শেষ কথাটি বলতে চান না। এটি নিঃসন্দেহে ভালো কথা নয়। বক্তাকে এই কথা মনে রাখতে হবে, দীর্ঘ বক্তৃতা সব সময়ই বিরক্তিকর। বক্তার কাছে তাই সময়জ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
১১. **ব্যক্তিগত আক্রমণজনিত ক্রটি :** আলোচকবৃন্দের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে

আছাশীল ব্যক্তি থাকেন। তাদের বক্তৃতার সময় বাস্তবনৈতিক ভাবাদর্শ প্রকাশ পায়। বক্তৃতায় যেহেতু পূর্ববর্তী বক্তাদের বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করার সুযোগ রয়েছে, তাই কোনো বক্তার একেবারেই উচিত হবে না অন্য কোনো বক্তাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা। ভিন্নমত পোষণের সময় বক্তার বিনয় ও নম্রতা বজায় রাখা উচিত। পূর্ববর্তী বক্তার কোনো বক্তব্যকে তিনি কেন মানতে পারছেন না, ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ না করে যুক্তির মাধ্যমে তিনি তা বুঝিয়ে দেবেন। তার কণ্ঠস্বরের উচ্চতা ও উত্তাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১২. **দর্শক-শ্রোতার যোগ্যতা অনুযায়ী ভাষা নির্বাচন :** কাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন বক্তাকে তা খেয়াল রাখতে হবে। কেমন ধরনের দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত, তা ততটা বিবেচ্য নয়, তটা বিবেচ্য দর্শক-শ্রোতার শ্রেণিগত স্তর। সুশিক্ষিত-বিদগ্ধ সুদীর্ঘজনের সামনে বক্তা যে মার্গের ভাষা ব্যবহার করতে পারেন, অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত দরিদ্র জনতার সামনে সে ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করা যায় না। নেক্ষেত্রে ভাষা তুলনামূলক সহজ ও সরল হতে হবে। বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সামনে বক্তব্য উপস্থাপনের সময় বক্তার ভাষা শিশু-কিশোর মন ও মননের জন্য উপযুক্ত সহজ সরল হওয়া উচিত। ভাষা দর্শক-শ্রোতার সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন ও মানানসই হতে হবে।
১৩. **মুদ্রাদোষ পরিহার্য :** সব মানুষেরই কম-বেশি মুদ্রাদোষ থাকে। বক্তৃতা উপস্থাপনের সময় তা পরিহারের জন্য সচেতন ও সচেতন থাকতে হবে।
১৪. **আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি :** স্পষ্ট এবং শুদ্ধ উচ্চারণে বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। বক্তার কণ্ঠস্বর হতে হবে উদাত্ত, পরিশীলিত ও শ্রুতিমধুর। বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বক্তাকে কণ্ঠস্বরের গুণনামা করাতে হয়। এতে বক্তব্যের শ্রুতিতে মাদুর্য সৃষ্টি করে। মাইক্রোফোন থেকে কতটা দূরত্ব বজায় রাখলে বক্তব্য স্পষ্ট শোনা যায়, সে ব্যাপারেও খেয়াল রাখতে হবে। বক্তাকে মাইক্রোফোন ব্যবহারের কলাকৌশলে পারদর্শী হতে হবে।
১৫. **রুচিশীল পোশাক নির্বাচন :** বক্তার পরিশীলিত ও রুচিশীল পোশাক পরিধান অপরিহার্য, যা বক্তাকে মার্জিত, পরিশীলিত ও আকর্ষণীয় করে তোলে। খুব বেশি দামি পোশাক পরিধান করলেই পরিশীলিত রুচি প্রকাশ করে না, আবার কম দামি পোশাক পরিধান করলেই যে অনাধুনিক মনে হবে, তা-ও নয়। রুচিশীলতা কখনো মূল্যে বিচার করা যায় না।

বক্তব্যের নমুনা

১। একুশের চেতনা ও তাৎপর্য বিষয়ে বক্তব্য

শ্রদ্ধেয় সভাপতি এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ। বক্তব্যের শুরুতেই গভীরভাবে স্মরণ করছি মহান একুশের, অমর শহিদদের, যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

আমাদের জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি এক বিশেষ দিন। একুশ জড়িয়ে আছে আমাদের

চেতনায়, বিপ্লবে, বিদ্রোহে; একুশ আমাদের সাহস, একুশ মানে মাথা নত না করা। একুশ মানে স্বাধীনতার প্রথম পরশ। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনামলে পাকিস্তানি সরকার বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে তাদের পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিল। তারা বাঙালিদের নিজস্বতাকে খুন করে তাদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছিল। সেই লক্ষ্যে তারা উর্দুকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা ঘোষণা করে। কেননা তারা জানত, বাঙালির মুখে ভাষা কেড়ে নিয়ে অন্য ভাষায় কথা বলতে বাধ্য করাই মাধ্যমেই বাঙালি জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করা সম্ভব। কিন্তু বাঙালি জাতি এই অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে নেয় নি। বাদ্য পূর্ববাংলা তখন হয়ে উঠেছিল বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদমুখর। তারই ফলে ১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ছাত্ররা ৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন বেশ কয়েকজন ছাত্র-জনতা। পরবর্তীকালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় এবং একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘোষণা করা হয় ভাষা দিবস হিসেবে।

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে এক বিশেষ তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করে। মাতৃভাষার গৌরব রক্ষার্থে রক্তদানের ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। একুশ ফেব্রুয়ারি শুধু আমাদের বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন নয়। এই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়। এই আন্দোলনের ভেতর দিয়ে জন্ম নেয় আমাদের স্বাধিকার চেতনার কোরক। পরবর্তী সময়ের সকল আন্দোলনে প্রেরণা হয়েছে একুশ ফেব্রুয়ারি। হয়েছে সংগ্রামের অঙ্গীকার। একুশে ফেব্রুয়ারির মাধ্যমেই বাঙালি প্রমাণ করেছে দেশের আয়তনে আমরা ছোট হতে পারি, কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা ক্ষুদ্র নই। আজ একুশ পেয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি-হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের।

কিন্তু বর্তমানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একুশের তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে মনে হয়। বিশেষ করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজি শিক্ষা একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। একটি বিশেষ প্রেণি এখন মনে করে যে, ইংরেজি শিক্ষা ছাড়া জীবনে উন্নয়ন সম্ভব নয়। আবার অনেকে ইংরেজি শিক্ষাকে আভিজাত্যের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করেন। আমাদের উচ্চশিক্ষার মাধ্যম অনেক ক্ষেত্রে এবং অফিস-আদালতে এখনও ইংরেজি প্রচলিত আছে। অন্যদিকে, আমাদের নতুন প্রজন্ম ইংরেজি সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতিতে অভিযুক্ত হয়ে উঠেছে। ফলে দেশে বাংলা ভাষা তার প্রাপ্য মর্যাদা হারাচ্ছে। ঢাকা শহরসহ বিভিন্ন মফস্বল শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো গাভিয়ে উঠছে কিন্ডারগার্টেন স্কুল। ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলো আমাদের কিশোর-কিশোরীদের দেশের মধ্যেই পরবাসী করে তুলছে। তাদের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে বিদেশিয়ানা। আমরা ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে নই, কিন্তু মাতৃভাষার মর্যাদা উপেক্ষা করে নয়। তাই এখন আমাদের এগিয়ে আসতে হবে বাংলা ভাষাকে তার স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনতে। দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন করতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে নিজের মাতৃভাষার প্রতি করে তুলতে হবে শ্রদ্ধাশীল। আমাদের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে করে তুলতে হবে শিক্ষিত। দেশের সমগ্র জনগণ শিক্ষিত হলে দেশকে উন্নয়নের

পথে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। সম্ভব হবে বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তার স্বমহিমায় সমৃদ্ধ রাখা।

তাই আসুন, একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্যে উদ্ভুদ্ধ হয়ে আমরা সবাই এগিয়ে আসি এবং মাতৃভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। আমরা যদি নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ভুলে গিয়ে অপরের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আপন করে গ্রহণ করি তাহলে তখনই জাতীয় জীবনে উন্নয়ন ঘটাতে পারবো না এবং পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা একটি পরজীবী জাতি হিসেবে গণ্য হবে। ধন্যবাদ।

বক্তা :	বৌশন আলম প্রভাসক, বাংলা দিকপাইত কলেজ, জামালপুর
লক্ষ্য :	স্থানীয় সুদীর্ঘ ও ছাত্রবৃন্দ
তারিখ :	২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০

২. মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তব্য।

হনুমানমোহন মহাবিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকবৃন্দ। আমি প্রথমেই মহান মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করি। আমাকে আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আজ ২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস, আমাদের জাতীয় জীবনে এই দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। ২৫ মার্চ কালরাতে বাঙালি জাতিসত্তার উপর যে নির্মম এবং পৈশাচিক অত্যাচার নেমে আসে তার ফলে ২৬ মার্চ ভোর বেলা থেকে শুরু হয় প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধই বৃহত্তর পরিবেশে রূপ নেয় স্বাধীনতা সংগ্রামে। এই স্বাধীনতা সংগ্রাম মুহূর্তের ফসল নয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন; ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন; ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন; ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন-ধাপতলো অতিক্রম করে বাঙালির হাজার বছরের আকাঙ্ক্ষা রূপ পায় একটি সশস্ত্র সংগ্রামের আকারে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হয়েও ক্ষমতায় যেতে পারে নি। পশ্চিমা কূটনীতির ষড়যন্ত্রের জাল বুনে বাঙালির স্বাধিকারের পথ অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সেদিনের সে বীজমন্ত্র থেকেই ২৬ মার্চের তত্তদিনে স্বাধীনতা রূপ বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্যম ঘটে। দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রামের পর আমরা বিজয় লাভ করি। এই নয় মাসের ইতিহাস রক্তাক্ত, বেদনাসিক্ত, ককরণ এবং মৃত্যুদীর্ঘ। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তার দোসররা এ নয় মাসে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে পৈশাচিক আনন্দে হত্যা করেছে। সেদিনের সে হত্যায়ত্তের ইতিহাস সমগ্র বিশ্বের চেতনাকে আজও শিহরিত করে।

আমাদের স্বাধীনতা কারো দয়ার দান নয়। এ আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামে অর্জিত অনেক তামের ফসল। অতীত স্বরণ শুধু এটা নয়, এ এক রক্তাক্ত ইতিহাস বর্ণনা। এই ইতিহাস বার বার আমাদের স্বরণ করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য। আমাদের দেশ শুধু ইট-কাঠ-ইস্পাতে গড়লেই চলবে না, গড়তে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অন্তর্গত করে। প্রতিনিয়ত আসছে তরুণ প্রজন্ম। তাদের জানাতে হবে, রক্ত আত্মত্যাগ আর রক্তের নিম্নিত্তে আমরা এ স্বাধীনতা অর্জন করেছি। দেশপ্রেমমূলক শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পৃক্ততা করার এখন প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে রাষ্ট্রনেতারা আমাদের সে পথেই পরিচালনা করবেন। তা করতে পারলেই স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছবে বলে আমার বিশ্বাস। ধন্যবাদ

বক্তা :	ড. ফজলে বাকি চৌধুরী সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
লক্ষ্য :	আনন্দমোহন মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
তারিখ :	২৬শে মার্চ, ২০১৯

৩. নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কে একটি মঞ্চ ভাষণ।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, উপস্থিত সুধীজন, আমাদের সালাম গ্রহণ করুন। এ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম।

আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। পৃথিবীতে কোনো মহৎ কাজই একা কারো পক্ষে করা সম্ভবপর নয়। দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককে অক্ষর জ্ঞান দেওয়ার। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে সকলে সহযোগিতা একান্ত দরকার। প্রকৃতপক্ষে এখনো আমাদের দেশে শতকরা ৫০ জন মানুষ নিরক্ষর। এর মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি। এ বিপুল সংখ্যক লোকের অক্ষর জ্ঞান দেওয়া কঠিন কাজ। কিন্তু কাজের কাঠিন্য দেখে ভয় পেলে চলবে না। মানুষকে অক্ষর জ্ঞান দান করে দীপ্যমান করে তুলতে হবে প্রতিটি অঞ্চলকে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা যেমন দরকার তেমনি দরকার এই কর্মসূচিকে সফল করে তোলায় জন্য। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে করে মহিলাদের মধ্যে শুবই দুরূহ কাজ। কারণ বয়স্ক লোকেরা মনে করেন এই শিক্ষা তাদের কোনো কাজে আসবে না, অর্থনৈতিক সুবিধা বা সামাজিক মর্যাদাও বাড়বে না। ফলে শিক্ষাকার্য পরিচালনা কর্মী পাওয়া গেলেও শিক্ষা গ্রহণকারী লোক পাওয়া কঠিন। যারা অশিক্ষিত তারা সকলেই প্রায় গরিব। সারাদিন শ্রম দিয়ে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তারা মনে করেন যেখানে অর্থনৈতিক সুবিধা নেই সেখানে বাড়তি শ্রম ব্যয় করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বাস্তবে তাই দেখা যাচ্ছে। নিরক্ষর মুক্ত দেশ গড়ার কার্যক্রম আশাভীত সফলতা লাভ করতে পারছে না। আজ সময় এসেছে মানুষকে বোঝাবার। মানুষ লিখতে এবং পড়তে জানলে অশিক্ষিতের অপমান থেকে তিনি রক্ষা পাবেন। দেশবাসীকে বোঝাতে হবে, যে করেই হোক অক্ষর জ্ঞান লাভ করতেই হবে। আসুন, আজ থেকে আমরা সে ব্রত গ্রহণ করি। সকলকে ধন্যবাদ।

বক্তা :	ভোনাস গোমেজ
মক্কা :	গ্রন্থান, সাক্ষরতা সবার জন্য
তারিখ :	মাতৃপর্যায়ের কর্মী
	২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২০

৪. নবীনবরণ অনুষ্ঠানে নবীনদের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি।

শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ, সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী এবং ছাত্রছাত্রী ভাইবোনেরা।

আজকের এই দিন আমাদের নবীনদের জন্য এক স্মরণীয় দিন। আজ আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়ার জন্য যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে তার অত্যন্তিকতায় আমরা আপ্তত, তার উচ্ছ্বাসে আমরা ধন্য। শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকবৃন্দ ও অগ্রজ ভাইবোনেরা আমাদের আজ যে প্রীতিবন্ধনে যুক্ত করলেন তার আবেদন চিরজীবন আমাদের কৃতির পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকবে।

এতদিন কঠোর নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে আমাদের বিদ্যার্জন করতে হয়েছে। তারপর বিদ্যালয়ের গতি পার হয়ে বৃহত্তর শিক্ষা পরিমণ্ডলে প্রবেশ করতে গিয়ে নানা উৎকর্ষা ও উদ্বেগে আমাদের দিন কেটেছে। এই কলেজে ভর্তি হতে পারব কিনা, শেষ পর্যন্ত কোথায় ভর্তি হতে পারব তা নিয়ে আমাদের তো বটেই বাবা-মায়েরও চিন্তার শেষ ছিল না। তারপর ভর্তি হওয়ার পর আর এক চিন্তা-নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের কতটা মনিয়ে নিতে পারব? আমাদের এই দ্বিধা কেটে গেল যখন দেখলাম আমাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করলেন কলেজের অগ্রজ ভাইবোনেরা ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ। আর আজ এই অনবদ্য আয়োজনের মাধ্যমে আমাদের যেভাবে কাছে টেনে নেওয়া হচ্ছে তাতে সমস্ত বিধা, সমস্ত উদ্বেগ কোথায় মিলিয়ে গেছে। আজ এই মহান বিদ্যাপীঠের পবিত্র অঙ্গনে সকলের সঙ্গে নিজেদেরও আমরা এখন একই পরিবারের সদস্য বলে ভাবতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আমরা সাহস পাচ্ছি, ভরসা পাচ্ছি, উৎসাহ পাচ্ছি। আমাদের সঙ্গী হিসেবে আছেন অগ্রজপ্রতিম ভাইবোনেরা, আর আমাদের অভিভাবকত্ব পথনির্দেশক হয়ে আছেন সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ। সহৃদয় সাহচর্য ও প্রেরণায় আপনারা যে আমাদের ভবিষ্যৎ রচনার সাহস সঞ্চয় করেছেন এ জন্যে আপনাদের কাছে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা এই কলেজে নতুন। কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। তবু এটা বুঝতে পারছি যে, জ্ঞানচর্চার এক বৃহত্তর অঙ্গনে আমরা এসে পড়েছি। বন্ধ গতি ছেড়ে বেড়িয়ে আসতে পেরে ভালোই লাগছে। আবার এমন মুক্তি আগে পাই নি বলে ভয়ও লাগছে। আমাদের এই পথ পরিক্রমায় অগ্রজদের দৃষ্টান্ত দেখে আমরা পথ চলতে চেষ্টা করব। আমাদের বিশ্বাস, আপনাদের নির্দেশিত পথ আমাদের জ্ঞানার্জনের পথকে করবে সহজতর।

আশা করি, সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের সল্লেখ সাহচর্য ও নির্দেশনায় আমরা সত্যিকারের মানুষ হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার পথে ভালোভাবে অগ্রসর হতে পারব। দোয়া ও আলীর্বাদ করুন যেন আমরা নিজেদেরকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

ভোনাস অগ্রজ ভাইবোনেরা এই কলেজের ঐতিহ্য রক্ষায় আমাদের ভূমিকা পালনের কথা

বলেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের নির্দেশনা এবং অগ্রজ ভাইবোনদের সহায়তায় আমরা সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারব। এ প্রসঙ্গে মনে পড়েছে কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য পঙ্ক্তি :

তোমার পতাকা যারে দাও
তায়ে বহিবারে দাও শক্তি।

আমরা আশা করি, আপনাদের সবার সহযোগিতা পেলে এ প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যের গৌরবময় পতাকা আমরা সম্মানের সঙ্গে বহন করতে পারব।

বর্তমানে দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অস্থিরতা ও নৈরাজ্যের শিকার। আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের এই বিদ্যানিকেতন সেসব থেকে মুক্ত। তাই আমরা আশাবাদী, এই কলেজের নির্মল পরিবেশ আমাদের উজ্জ্বল জীবন গঠনে সহায়ক হবে। সবশেষে, আমাদের শিক্ষাসাধনা ও জীবন বিনির্মাণে আমরা সবার গঠনমূলক নির্দেশনা ও সহায়তা কামনা করি। আমাদের অজ্ঞতাজনিত কোনো ত্রুটি ঘটলে তা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখার অনুরোধ জানাই।

আজকের এ অনুষ্ঠানে আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়ার জন্যে আবারও সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আপনাদের সবার জীবন সুন্দর হোক। আমাকে নবীনদের পক্ষ থেকে কিছু কথা বলতে দেওয়ার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

বক্তা :	অনিলা চৌধুরী ক্রমিক নং -০১ একাদশ শ্রেণি বিজ্ঞান শাখা হুবিদি কলেজ, সুনামগঞ্জ
তারিখ :	১ লা জুলাই, ২০১৯

৫. নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে অধ্যক্ষের ভাষণ।

সুধন সভাপতি, নববর্ষ উৎসবে সমবেত সুধীবৃন্দ, আমাকে এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে ধন্যবাদ। আমি প্রথমেই সবাইকে বঙ্গাব্দের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই : শুভ নববর্ষ!

আজ মনে পড়েছে আমার জীবনে নববর্ষ উৎসবের নানা অনুঘটন। আমাদের ছেলেবেলায় পরান বৈশাখ ছিল হালখাতার দিন। ব্যবসায়ীরা সেদিন সারা বছরের হিসাব-নিকাশ করে আগের বছরের পুরনো খাতা তুলে রেখে নতুন খাতা খুলতেন। মুঘল আমলে রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে হালখাতার এই প্রথা সূচিত হয়। তখন রাজস্বের হিসাব রাখা আরম্ভ হয় চান্দ্র বছর হিজরির বদলে সৌর বছর বঙ্গাব্দে এবং সে বঙ্গাব্দের সূচনা হয় বৈশাখের প্রথম দিন থেকে। বাংলা মাসের নামগুলো লক্ষ্য করলে মনে হয়, অগ্রহায়াণ থেকেই বছর শুরু হবার কথা। রাজস্বের হিসাব যে বৈশাখ থেকে রাখা হতো সেটা সত্য। আর তার ফলে হয়ত সকল ব্যবসা-বাণিজ্যে হালখাতার প্রচলন হয়ে যায়।

হোটেলোয় অভিবাসকদের হাত ধরে বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে গেছি আর মিষ্টি খেয়েছি, কখনও কখনও সঙ্গে করে নিয়েও এসেছি। নববর্ষের দিনে মাঠে-ময়দানে মেলা বসত। মেলায় পাওয়া যেত মাটির, বেতের, বাঁশের, কাঠের, তালপাতার, শক্ত কাগজের হরেক জিনিস। নানা বকম খাবারও পাওয়া যেতে। নিজে না গেলেও কেউ না কেউ আমার জন্যে মেলা থেকে কিছু কিনে আনতেন। পুতুলের শ্রোণীতে তুলো দিয়ে করা শ্যামুজিত ও নারকেলের হকো হাতে এক বৃক্ষ পাওয়া যেত—সর্বক্ষণ তার মাথাটা নড়ত। ওতে খুব আমোদ পেতাম। মোট কাগজের দুবোশের আকর্ষণ অল্পেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। শিকে বা নকশা করা সরাদও কেউ কেউ নিয়ে আসতেন উপহারস্বরূপ, কিন্তু সবই শিকেয় তুলে রাখা হতো অর্থাৎ ঝোলানো বা টাঙানো হতো না। খাবারের মধ্যে কদমা ছিল আমার খুব পছন্দ, বড় বাতাসাও। হালখাতার উৎসব সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই চালু ছিল। তবে বেশি ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। আমি খাঁটি ইংরেজ ব্রিটানের প্রতিষ্ঠানে এবং মধ্যবিত্ত মুসলমানের দোকানে হালখাতা উৎসব হতে দেখেছি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে অনেকে পয়লা জানুয়ারি থেকে হিসাব রাখতেন। সরকারি অর্ধ বছর শুরু হতো এপ্রিলে। এদিকে মহররম যদিও হিজরির প্রথম মাস, তবু তা কারবালার শোক স্মৃতি নিয়ে আসত। নিউইয়ার্স ডে করার মতো সামর্থ্য বেশি মানুষের ছিল না।

এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির পরে ক্রমবর্ধমান বাঙালি চেতনার জাগরণে। ঢাকার মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটে বা কার্জন হলে সন্ধ্যাবেলায় গীতবাদ্যের অনুষ্ঠান হতো, কিন্তু তার জন্য সকাল থেকে উদ্যোগ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন হতো না। তারপর বলধা গার্ডেনে কোনো এক পয়লা বৈশাখে খই মুড়ি খেয়ে গান গেয়ে নববর্ষের আদাহন হলো মুষ্টিমেয়ে মানুষের উপস্থিতিতে। তখন এ নিয়ে অনেকে হাসাহাসি করলেও সরকারের জুকুক্ষিত হয়েছিল।

বাংলা নববর্ষের উৎসব পাকিস্তান সরকার পছন্দ করছে না—এ কথা জানাজানি হওয়ার পরে সরকারের সাংস্কৃতিক নীতির প্রতিবাদ করতে এবং নিজেদের বাঙালি সভা জাহির করতে চারিদিকে পয়লা বৈশাখ উদযাপনের ধুম পড়ে গেল। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান ছায়ানাট্যের। রমনার বটমূলে নাগরিক মধ্যবিত্তের এই মিলনমেলা বাঙালিত্ব আর অসাম্প্রদায়িকতার সম্মিলনে পরিণত হয়। তারপর দেশব্যাপী নববর্ষের অনুষ্ঠান ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এই প্রতিবাদের আর আবশ্যিকতা রইল না। সরকার নিজেই নববর্ষ পালনে উদ্যোগী হলো। সুতরাং যা ছিল রাজনৈতিক প্রতিবাদের বিষয়বস্তু তা হয়ে উঠলো শুধু আনন্দের অনুষ্ঠান, মহামিলনের ক্ষেত্র। ক্রমেই এই অনুষ্ঠান বৃহৎ ও বিচিত্র হয়ে উঠেছে, ব্যাপক হয়েছে তো বটেই। এ কথা সত্য যে, বঙ্গবন্ধু আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি; কেননা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বাংলা তারিখের যোগ এখনও স্থাপিত হয়নি। তবু নাগরিক মধ্যবিত্ত 'দারুণ অগ্নিবাণে' তৃষিত হৃদয়ে 'দীর্ঘ দক্ষ দিন' পার করে নিয়ে যে আনন্দ ও তৃপ্তি পান তা নিখাদ।

বঙ্গ ভাষা কেন্দ্র আমাদের বাঙালিত্ব এখনও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। তাই নববর্ষ উৎসব নিয়ে আবার ধর্ম উত্তেজিত হওয়ার কিছু থাকে না। তবে এ প্রবীণ বয়সেও আমার বিশ্বাস, বাঙালি

নিজস্ব সংস্কৃতি ধারণ করে এগিয়ে যাবেই, প্রতিহত করবে নানা প্রতিবন্ধকতা। তাই কামনা করছি গান দিয়ে আরম্ভ হোক দিনটা, চলুক কবিতাপাঠ, বর্ণবহুল মিছিল দেখে আনন্দ পাক শিশু-কিশোরেরা। গ্রামের মেলায় যেমন, তেমন শহরের মেলায় ভিড় করুক নানা রকম লোক। তুচ্ছ বিষয় মনকে প্রফুল্ল করুক। নববর্ষ সার্থক হোক। সবার জীবনে আসুক মঙ্গল ও সাফল্য।

বক্তা :	মো. সুরজ্জামান অধ্যক্ষ সেবপুর সরকারি কলেজ, জেলা সেবপুর
লক্ষ্য :	ছাত্রছাত্রী ও সুধীজন
তারিখ :	১৪ই এপ্রিল, ২০২০

৬. 'যৌতুক একটি সামাজিক অভিশাপ' বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখার জন্য একটি লিখিত ব্যক্তব্য প্রস্তুত কর।

'যৌতুক একটি সামাজিক অভিশাপ' শীর্ষক আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও সুপ্রিয় সুধীবৃন্দ-আপনারা সবাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

নারী-পুরুষ মিশেই এ পৃথিবীর অসাধ্য কাজ সাধন করেছে। অথচ জগতের মাঝে তাদের অবদান কেউ স্বীকার করতে চায় না। বরং তাদের উপর চলে অমানবিক নির্যাতন। কার্জী নজরুল ইসলাম লিখেছেন:

বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

অতএব, নারীপুরুষের সমান অংশগ্রহণ সর্বত্র প্রয়োজন।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

সভ্যতার চরম উন্নতির যুগে বসবাস করেও আমরা এই অমর বাণী ভুলে গেছি এবং বর্বরতাকে হার মানিয়েছি। আমাদের সমাজে নারী নির্যাতনের মাত্রা এতোই বেড়ে চলেছে যে, আজকের তার দিক্কে সেমিনার করতে হচ্ছে। এই নির্যাতনের একটি মাধ্যম যৌতুক। যৌতুক প্রথার চ্যাবহতা আমাদের সমাজকে ক্ষেত্রবিশেষে পাশবিক করে তুলেছে।

প্রিয় সাথীরা,

হামরা যদি ভাবি, একটু চিন্তা করি-আমরা সকলেই কোনো-না-কোনো মায়ের সন্তান, কারো গাই, কারো বাবা, আর অন্যদিকে তারা আমাদের কারো না কারো খালা, ফুফু, চাচি, বোন, মা ইত্যাদি। এখন চোখ বন্ধ করে একটু ভাবুন যে, আপনার মাকে কেউ মারছে, বোনকে কেউ নিয়ে যাচ্ছে ধরে, অথবা তার স্বামী তাকে পেটাচ্ছে, এবং তা যৌতুকের জন্য। যৌতুক আসলে পুরুষকে মানসিকভাবে দারিদ্র্য করে দেয়। সে গরিব সেই শুধু যৌতুক চায় না, ধনীরাও চায়। এই মানসিক দারিদ্র্য রোগবিশেষ। এই রোগাক্রান্ত হয়ে আমরা পুরুষজাতি কেন নারী নির্যাতন

করবে? কেন আমরা নারীদেরকে সম্মান করতে পারবো না? আজ নারীর অধিকারকে দীকার করতে হবে। তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে হবে।

চপছিত সুধীমঞ্জলী,

মইন আছে: তবুও হীন অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে পুরুষরা। কারণ আইনের প্রয়োগ নেই। তবে আইনের চাইতে মানসিকভাবে যৌতুককে প্রত্যাখ্যান করা শিখতে হবে। এ ব্যাপারে কতিপয় প্রচেষ্টা উত্থাপন করে বক্তব্যের ইতি টানবো:

- ক. বাল্যবিবাহ রোধ
- খ. নারীশিক্ষার প্রসার
- গ. স্কুল-কলেজে যৌতুকবিরোধী রচনা পাঠ্যকরণ
- ঘ. নারীর শক্তি ও সম্ভাবনাকে শ্রদ্ধা করতে শেখানো।

স্বাক্ষর।

বক্তা : সুপ্রিয় চাকমা
আতজোকেট, জজ কোর্ট, জেলা বান্দরবান
দফা : নির্ধারিত অংশগ্রহণকারী
তারিখ : ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯